মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি, মাননীয় নৌ প্রতিমন্ত্রী, বিশেষ অতিথিবর্গ, শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত প্রধান আলোচক সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, বিআইডব্লিউটিএ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়সহ অন্যান্য সংস্থার সংস্থা প্রধানগণ। মঞ্চের সামনে আসীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এই আলোচনা সভার আয়োজনের জন্য যারা শ্রম ও মেধা দিয়েছেন এবং উপস্থিত প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ এবং অন্যান্য সম্মানিত সকলে।
আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে আমার সালাম/আদাব এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ শে মার্চের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আজকের আলোচ্য বিষয় “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন” বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। স্মরণ করি ১৫ আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদানদের, জেলখানায় শহীদ জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও বীরাঙ্গনা মা বোনদের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন:

সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলাদেশের স্থপতি বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন এর উপর আলোচনা করতে গেলে একটু গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তাঁর মত মহিরুহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বেশিরভাগ আলোচনাই অন্ধের হাতি দেখার মত হয়ে বাঘা বাঘা লোকেরাই খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। ‘বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও দেশের উন্নয়ন’ বিষয়ে বহু নামজাদা লেখক, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ ভলিউম ভলিউম গ্রন্থ লিখলেও লেখা শেষ হবেনা। আর লেখার আবেদনও কখনো শেষ হবেনা। উক্তরূপ ভূমিকার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতে চাই তাঁর জন্ম তিথি থেকে। ১৯২০ সালের ১৭ ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুংগিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধু এ ধরাধামে আগমন করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের গৃহ আলো করে। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন করেন। তিনি অতঃপর ক্যালক্যাটা ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৪৭ সালে বিএ পাশ করেন।

বঙ্গবন্ধুকে নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়েই মহাপ্রভূ আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন একজন Born leader বা জন্ম থেকেই নেতা। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের প্রতি দরদ, মাতৃভূমির প্রতি দরদ তার শৈশব থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। শৈশবেই তিনি স্কুল যাবার পথে শীতের কাঁপুনিতে কষ্ট পাওয়া একজন বৃদ্ধকে তার

নিজের শীতের কাপড় গা থেকে খুলে দিয়েছিলেন। তিনি ভবিষ্যতে তার নির্যাতিত দেশকে মুক্ত করতে নেতৃত্ব দেবেন, তার সুস্পষ্ট লক্ষণ তো শৈশবে মানুষের প্রতি মমত্ববোধের মাধ্যমে ফুটে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। স্কুল জীবনেই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলী ফুটে উঠে। ১৯৩৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের টুংগীপাড়া আগমনের সময় সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি শেরেবাংলার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মী হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেন এবং ১৯৪৩ সাল থেকে All India Muslim League Council এর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহারওয়ার্দীর একনিষ্ঠ অনুসারী হন।

১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য দাবীদাওয়ার আন্দোলনে সমর্থন দেয়ার জন্য ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। বঙ্গবন্ধু তার দক্ষতা ও আকর্ষক বাগ্মীতার মাধ্যমে ৬০ এর দশকেই দলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীকার দাবীর জন্য তিনি ১৯৬৬ সালেই ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন। যার জন্য তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো হয়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে তিনি ভীত না হয়ে দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যান। সারা দেশের ছাত্র আন্দোলন বেগবান হলে ১৯৬৯ সালে ২২ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধুকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আহুত রমনা রেসকোর্সের সভায় তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে সরকার গঠনের কথা থাকলেও শুরু হয় পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের চক্রান্ত। বঙ্গবন্ধু কে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। ১৯৭১ এর মার্চের শুরু থেকেই পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতার জন্য এক ঐতিহাসিক ও অনবদ্য ভাষণ দেন। তিনি জনতার উদ্দেশ্যে প্রথমেই বলেন, “ভাইয়েরা আমার, আপনারা সবই জানেন ও বুঝেন”। তারপর তিনি তার ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতিটি কথায় মানুষকে উজ্জীবিত করেন। তিনি বলেন, “মরতে যখন শিখেছি, তখন কেউই আর আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না”। তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে শত্রুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান এবং “এদেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশআল্লাহ” বলে জাতিকে ভরসা দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ এখন আন্তর্জাতিক সম্পদ। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর অন্তর্ভুক্ত। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানী হায়েনা বাহিনীর দল নিরীহ বাঙ্গালীর ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরুকালে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পর তাকে আটক করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেই সমগ্র বাংলাদেশীরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বঙ্গবন্ধুর আহবানে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় অর্জিত হলে বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার গঠনের পর মাত্র সাড়ে ৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তারপর ১৯৭৫ সালে ১৫ আগষ্ট নির্মমভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হন। বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান তাঁর দুইকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা।

বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় থাকলেও এক অভাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা করে বঙ্গবন্ধু দেশকে ধাপে ধাপে উন্নয়নের রাজপথে নিয়ে যেতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে দেশের জন্য যা করেছেন তা এক বিস্ময়কর ইতিহাস হয়ে আছে।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত "বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২" জারি করা হয়। এই আদেশ বলে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপরিষদ আদেশ জারী করেন এবং তা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম দিয়ে ১৩ মার্চ ১৯৭২ এর মধ্যে সমস্ত ভারতীয় সেনা এদেশ থেকে প্রত্যাহারে সফল হন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল সকাল ১০ টায়। নয় মাসের যুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বাংলাদেশকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দিয়ে যায়। বাংলাদেশকে চিরতরে ধ্বংস করার পাকিস্তানীদের এই হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য অনেক স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর সরকার গুরুত্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান এবং খাদ্য সরবাহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০৭ কোটি টাকার একটি স্বল্প মেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালের জুন পর্যন্ত ৬ মাসের জন্য। এতে প্রায় দুই কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনের নিবেদিত কর্মীদের মাধ্যমে এ সফল পুনর্বাসন কর্মসূচি জাতিসংঘ কর্তৃক প্রশংসিত ও স্বীকৃত হয়। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয় –

"It was observed in this Report that thanks to the coordinated efforts of Bangladesh and …… that the country is settling down as an organized community with a Government, working steadily through and towards democratic procedure"

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মত বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা এবং সারাদেশে একই সাথে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরির কার্যক্রমও শুরু করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অদম্য নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও রেল যোগাযোগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা করা সম্ভব হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, নৌবাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন ও রাশান সরকারের কারিগরী সহযোগীতায় পোর্ট এলাকা থেকে মাইন অপসারণ করা হয়। পোর্টকে কর্মক্ষম করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং তাদের স্বদেশ বিনির্মাণে কাজে লাগানোর জন্য বঙ্গবন্ধু সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ (স্বাধীনতার মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে) "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে এটিকে উচ্চ পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি মনোনিবেশ করেন। একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান ও তিনজন সদস্য সমন্বয়ে এ কমিশন গঠন করা হয়। মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়া হয় ডেপুটি চেয়ারম্যানকে এবং সদস্যগণের পদমর্যাদা দেয়া হয় প্রতিমন্ত্রীর। কমিশন সরাসরি সরকার প্রধানের অধীন ন্যস্ত করা হয় এবং এর অধীন ১০টি বিভাগ করা হয়। এগুলো হলো-সাধারণ অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বহিঃসম্পদ ও প্রশাসন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য পৃথকভাবে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা পরবর্তীকালে "আইএমইডি" নামে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে বহিঃসম্পদ বিভাগকে পরিকল্পনা কমিশনের বহির্ভূত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন এবং উন্নয়নকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) চূড়ান্ত করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য দেশবাসীকে বঙ্গবন্ধু কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের জন্য ডাক দেন। প্রথম পাঁচসালার পরিকল্পনার মুখবন্ধে জাতির পিতা বলেন-

"দেশের জনগণ যদি সর্বাত্মক সংকল্প নিয়ে কঠোর পরিশ্রম এবং অপরিহার্য আত্মত্যাগী না হয়, তাহলে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারেনা। সে পরিকল্পনা যতই সুপরিকল্পিত হোক।"

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ছয়টি খাতে মোট ৪৪৫৫ কোটি টাকার ব্যয় কাঠামো ঠিক করা হয়। যার ৬০ ভাগ (২৬৯৮ কোটি) টাকা অভ্যন্তরীণ এবং ৪০ ভাগ (১৭৫৭ কোটি টাকা) বৈদেশিক উৎস হতে সংগৃহীত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের ৩৯৫২ কোটি টাকা সংস্কার খাতেও ৫০৩ কোটি টাকা বেসরকারী খাতে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে জাতির সামনে মোট চারটি বাজেট পেশ করা হয়। প্রথম তিনটি বাজেট পেশ করেন তাঁর সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ। চতুর্থ ও শেষ বাজেট পেশ করেন পরবর্তী অর্থমন্ত্রী ড: এ আর মল্লিক।

কৃষক-শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের উদ্যোগ নেন। শুধু চাষী ও ভূমিহীন মজুরের জন্য সমবায় সম্প্রসারণের কর্মসূচি দেয়া হয়। গৃহায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা সম্প্রসারণ, শহরে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং সম্পত্তির মালিকদের আকাশচুম্বী মুনাফার সীমারেখা টেনে দেয়ার প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন-

"কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৮০ ভাগের মালিক আপনারা। এখন উৎপাদন বাড়িয়ে সকলে মিলে কাজ করে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে হবে বাঙ্গালিজাতি স্বাধীনতার পবিত্র আমানত রক্ষার উপযুক্ত।"

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজ গঠনমূলক একটি সার্বিক রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বঙ্গবন্ধু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যা বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বঙ্গবন্ধু তার জীবদ্দশায় শিক্ষা সম্পর্কিত যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন সেগুলো হলো-

. প্রাইমারী স্কুল অ্যাক্ট ১৯৭৪
. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধ্যাদেশ ১৯৭৩
. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩
. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩
. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩
. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩
. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান আদেশ ১৯৭৩
. মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৩
. প্রাইমারী এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৭৪

বঙ্গবন্ধু কৃষি ও সমবায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, কৃষির উন্নতি ছাড়া এদেশের মানুষের মুক্তি আসতে পারেনা। কৃষকরাই এদেশের প্রাণ। আর বঙ্গবন্ধু সমবায়কে দেখতেন নতুন সমাজ, আদর্শ সমাজ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে।

শিক্ষা বিস্তার ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন নিম্নোক্ত অনুপম পদক্ষেপ :

(ক) মার্চ ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ সময়কালে শিক্ষার্থীদের বকেয়া ফি মওকুফ
(খ) শিক্ষকদের নয় মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ
(গ) ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা
(ঘ) ৯০০ কলেজ ও ৪০০ হাইস্কুল পুনঃনির্মাণ
(ঙ) ১,৬৫,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ এবং ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এছাড়া ১১০০০ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।
(চ) ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন-

“শ্রমিক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ মিল-কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্প বিল্লব সফল করে তুলুন। কৃষক ভাইদের প্রতি অনুরোধ, বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন। ছাত্র ও যুব শক্তির প্রতি আমার অনুরোধ, নিজেদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল। .....সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আমার নির্দেশ, দায়িত্ব পালনে আরও মন দিন। প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূর করূন। শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতি আমার আবেদন-দেশ গড়ার সংগ্রামে, আপনারাও কিছুটা অংশ নিন।”

১০ নভেম্বর ১৯৭৩ The Jute Research Institute Act, 1974 প্রণয়ন করেন। এই আইনের আওতায় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধু দেশের খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য ও শিশু উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ছিল দূরদর্শী কূটনৈতিক জ্ঞান। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে ভারতের সাথে বাংলাদেশের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিগুলো হলো-

1. Treaty of friendship, cooperation and Peace (March 19, 1972)
2. India-Bangladesh Trade Agreement (March 28 1972)
3. New Trade Agreement (July 5, 1972)
4. Land Boundary Agreement (May 16, 1972)
5. India-Bangladesh Agreement on the Peaceful Use of Autonomic Energy (August 27, 1974)
6. Indo-Bangladesh Air Agreement (July 3, 1974)
7. India-Bangladesh Cultural Agreement (September 27, 1974)
8. Indo-Bangladesh ad-hoc Agreement on Farakka (April, 8, 1975)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বঙ্গবন্ধু জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। স্বাধীনতার প্রথম তিন মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও ফ্রান্সসহ ৬৩ দেশের স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হন। অতি অল্পসময়ের মধ্যে ভারত ছাড়াও যুক্তরাজ্য ও সুইডেনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ও চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বিশ্বব্যাংক, আইডিবি, IMF, UNCTAD, UNESCO, GATT, ADB সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সদস্যপদ এসময় লাভ হয়। অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান চিরস্মরণীয়।

নৌপথ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ভাবনা স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ছিল। ১৯৫৬ সালের আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে সত্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে স্পষ্টভাবে নৌপথ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নের প্রতি জোর দেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্প মেয়াদী শাসনকালেই বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে নৌ, রেল ও সড়ক পরিবহনের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। পরবর্তীকালে ৮ জুলাই ১৯৭৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পোর্ট, শিপিং ও আইডব্লিউটি মন্ত্রণালয় (নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়) নিজ দায়িত্বে রাখেন। তিনি বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি কে ঢেলে সাজান। ১৯৭২ সালে তিনি বিআইডব্লিউটিসি প্রতিষ্ঠা করেন। নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড ও ইঞ্জিয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং খুলনা শিপইয়ার্ড গঠন করেন। দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে এবং বঙ্গোপসাগরে দেশের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৩ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ২৮ শে অক্টোবর ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে সত্তরের নির্বাচনের প্রাককালে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন-

> “পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ-প্রশিক্ষণ গ্রহণের অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। ..... যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে উত্তর বঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। ..... অভ্যন্তরীণ নৌ ও সামুদ্রিক বন্দরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।”

১৫ মার্চ ১৯৭১ সালের দৈনিক পাকিস্তান ও পূর্বদেশ পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু বলেন-

> “এদেশের আইনগত শাসনকর্তা হিসেবে আমি নির্দেশ দিচ্ছি-
> -পোর্ট কর্তৃপক্ষ সর্বদা সক্রিয় থাকবেন, যাতে জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকে। ..... . সমস্ত জাহাজ বিশেষ করে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য বহনকারী জাহাজ থেকে মাল খালাস যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই চেষ্টা পুরোদমে করতে হবে.....
>
> -অন্তদেশীয় নদী কেন্দ্রিক বন্দরসমূহ সুষ্ঠু চালু রাখার জন্য EPSC এবং অন্তদেশীয় নদী পরিবহন এবং ডব্লিউটিএর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী কাজ করবেন। কিন্তু জনগণের দমনের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে সহযোগীয়তা করা যাবে না।”

২২ জানুয়ারি ১৯৭২-এ Oxfam-এর কর্মকর্তাদের সাহায্য করা সংক্রান্ত আলোচনায় বলেন-

“Ferries are and will be the life lines for my people; please discuss with officers of the Bangladesh Inland Water Ways Authority and see what Oxfam can do”

বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-বাণিজ্য ও ট্রানজিট প্রটোকল (পিআইডব্লিউটিএন্ডটি) ১৯৭২ সালের ১লা নভেম্বর স্থাপিত হয়। বিমান, সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে এমন কোন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নেই যা তিনি গ্রহণ করেননি। স্থানীয় সরকার, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সেক্টর উন্নয়ন, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য. শিল্প কারখানা স্থাপন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক, আমদানি-রপ্তানি নীতি, প্রশাসনিক সংস্কার, সিভিল সার্ভিসে মেধা ও দক্ষতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, সরকারী কর্মচারীদে দিক নির্দেশনা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ডাক ও টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন, সম্প্রচার, চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বেতার টেলিভিশন, চলচিত্রে ও প্রকাশনা, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী (তিন বাহিনী) গঠন ও শক্তিশালীকরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ পরিকল্পনা, পরামাণু শক্তি গবেষণা, শ্রমিক কল্যাণসহ যাবতীয় বিষয়ে বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশের উন্নয়নের জন্য যে সর্বব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনা করে গেছেন এবং যত দ্রুত এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে পেরেছিলেন যে, তা দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদগণের গবেষণার বিষয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, প্রজ্ঞা, মেধা, তাঁর প্রতি জনমানুষ ও সরকারি কর্মচারীদের আস্থা এবং ভালবাসার জন্য।

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাতের মাধ্যমে এই অদম্য উন্নয়ন যাত্রাকে পিছিয়ে দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। আমরা সৌভাগ্যবান যে, আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের কান্ডারী হিসেবে আমাদের মাঝে আছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা হিসেবে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বসভায় দেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে এদেশের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এসডিজি ও এসডিজির সফল বাস্তবায়ন, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মাথাপিছু জিডিপির বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি বিশ্বে অবাক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। Leadership Matters –এই সত্য এখন সারাবিশ্বে আলোচিত হচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে নিজস্ব/দেশজ অর্থায়নে। মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে, কর্ণফুলি টানেলেসহ ভৌত উন্নয়নকে বিশ্ববাসী Magical development বলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ। ১০০ বছর মেয়াদী বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রবাসী নেতৃত্বের ফসল।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা জাতির পিতার উন্নয়ন আদর্শকে মনে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাব এটাই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।